প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতে সৃষ্ট সংকট বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। প্রাথমিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাব সীমিত থাকলেও ২০০৮ সালের শেষার্ধে মহামন্দার রূপ ধারণ করে। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি) বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার আশঙ্কা করছে। এসত্ত্বেও দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতের সংকটের ফলে সৃষ্ট মহামন্দার প্রভাব ইতোমধ্যে আমাদের অর্থনীতিতেও সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত মহামন্দার অভিঘাত এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এতটা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেনি। আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কযুক্ত দেশসমূহে আর্থিক মন্দার কারণে ভোক্তাব্যয় ব্যাপকহারে হ্রাস হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের রপ্তানি খাতের ওপর। চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৪ শতাংশের ওপরে থাকলেও এ হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উন্নত দেশসমূহে ব্যাপকহারে বেকারত্ব বৃদ্ধি, কর্মচ্যুতি ও শ্রমমজুরি হ্রাস পাওয়ায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনশক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তথাপি দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। মহামন্দার কারণে চলতি অর্থবছরে বড় ধরণের অভিঘাত না আসলেও ভবিষ্যতে এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করা দেশের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বমন্দার প্রভাব সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জিডিপিতে বিস্তৃত খাত হিসাবে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ২০.৬০ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে বিস্তৃত কৃষি খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ১.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। চলতি অর্থবছরে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এই চারটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট স্থুল দেশজ উৎপাদে সমন্বিত সেবা খাতের অবদান ৪৯.৭ শতাংশ এবং এ খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি প্রথমবারের মতো ৬০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, এ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি যথাক্রমে ৬৯০ ও ৬২১ মার্কিন ডলার।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.০ শতাংশ ও ৩২.৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপি'র শতকরা হারে মোট বিনিয়োগে বেসরকারী খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান রয়েছে। চলতি (২০০৮-০৯) অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ যথাক্রমে জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ ও ১৯.৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

মুল্যস্ফীতি

গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক গড় মুল্যস্ফীতি ৯.৯ শতাংশ। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যফীতির হার ছিল ১০.৮ শতাংশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে টিসিবিকে আরও কার্যকর করাসহ যথাসময়ে আমদানীর সুবন্দোবস্ত ও বাজার পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য হ্রাসসহ মূল্যফীতির হার কমতে শুরু করে। মার্চ ২০০৯-এ মূল্যফীতির হার ৫.০ শতাংশে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যহ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি অনুকুল হওয়ায় মুল্য পরিস্থিতির এ ধারা নিকট ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক গড় মুল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশে দাঁড়াবে বলে মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) -তে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৯ লক্ষ ৮১ হাজার জনশক্তি বিদেশে গমন করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭৩.৯৪ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার জনশক্তি বিদেশে গমন করেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মুল্য অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত সংযুক্ত আরব আমিরাতে নির্মাণ শিল্পে ধ্বস নামে এবং মালয়েশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশের অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। উদ্ভুত এ সংকট উত্তরণ এবং নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করাসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন কোর্সে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আশা করা হচ্ছে অচিরেই জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। রেমিট্যান্স প্রেরণ পদ্ধতি ও সেবার মান বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। উল্লেখ্য, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে রেমিট্যান্স খাতে দেশ ৭৮৯০.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২৩.০ ভাগ বেশি।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকালে সামষ্টিক অর্থনীতির পরপর নির্ভরশীল খাতসমূহের যথাযথ স্থিতি এবং সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে কৌশলপত্রে একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (গবফরঁস ঞবৎস গধপৎড়বপড়হড়সরপ ঋৎধসবড়িৎশ-গঞগঋ) সংযোজন করা হয়। এতে জিডিপি, রাজস্ব খাত, মুদ্রাখাত ও বহিঃখাত এর মধ্যে কার্যকর সংযোগ দেখানো হয়েছে। অর্থ বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে এমটিএমএফ-কে হালনাগাদ করেছে। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ৩ বছর মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চলকের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌল নির্দেশকসমূহের গতিধারা ও প্রক্ষেপণ সারণি ১.১: -এ দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ১.১: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

নির্দেশকসমূহ	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ)	৬.৪	৬.২	৫.৯	৫.৫	৬.০	৬.৫
জিডিপি ডিফ্লেটর (শতাংশ)	৬.৮	৮.৮	৬.৪	৫.৮	৫.৫	৫.০
গড় মূল্যস্ফীতি (ভোক্তা মূল্যসূচকে)	৭.২	৯.৯	৭.০	৬.৫	৬.০	৬.০
স্থূল দেশজ বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	২৪.৫	২৪.২	২৪.২	২৩.৬	২৪.৩	২৫.২
মোট রাজস্ব (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১০.২	১০.৮	১১.২	১১.৫	১১.৩	১১.৫
কর	৮.১	৮.৮	৯.০	৯.৩	৯.২	৯.৪
কর বহির্ভূত	২.২	২.০	২.২	২.২	২.১	২.১
মোট ব্যয়	১৩.৪	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৫	১৬.১	১৬.২
চলতি ব্যয়	৯.৪	১২.৬	১১.৬	১২.১	১১.৬	১১.৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.০	৩.৩	৩.৭	৪.৪	৪.৬	৪.৭
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.২	-৫.১	-৪.১	-৫.০	-৪.৮	-৪.৭
অর্থায়ন (নীট)	৩.২	৫.১	৪.১	৫.০	৪.৮	৪.৭
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.১	৩.৫	২.৩	৩.০	২.৬	২.৩
ব্যাংক ঋণ	১.২	৩.০	১.৭	২.৪	২.০	১.৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	০.৯	০.৫	০.৬	০.৬	০.৫	০.৫
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.০	১.৬	১.৮	২.০	২.২	২.৪
মুদ্রা ও ঋণ (বছর শেষে শতাংশে পরিবর্তন)						
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২.৬	১৮.১	১৮.৬	১৭.৫	১৭.১	১৭.১
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.৪	২১.৮	১৮.৯	১৯.২	১৮.৮	১৮.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৫.০	২৪.৯	১৭.৫	১৮.৩	১৮.৫	১৮.৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (এম২)	১৭.১	১৭.৬	১৭.২	১৬.৩	১৬.২	১৬.০
বহিঃস্থ লেনদেনের ভারসাম্য (শতাংশে পরিবর্তন)						
রপ্তানি এফ ও বি	১৫.৮	১৫.৭	১২.০	১২.৫	১৭.৫	১৮.৫
আমদানি এফ ও বি	১৬.৬	২৫.৬	১৩.০	১৩.০	১৭.০	১৬.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে)	১.৪	০.৮	০.৬	০.২	-০.১	-০.৪
লেনদেনের ভারসাম্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)						
রপ্তানি	১২.১	১৩.৯	১৫.৬	১৭.৬	২০.৬	২৪.৫
আমদানি	১৫.৫	১৯.৫	২২.০	২৪.৯	২৯.১	৩৩.৮
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	৬.০	৭.৯	৯.৪	১০.৬	১১.৬	১২.৮
স্থূল অফিসিয়াল মজুদ (বিলিয়ন ইউ, এস, ডলার)	৫.১	৬.১	৬.৫	৭.৫	৮.৫	৯.৫

উৎসঃ বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও সিজিএ ডাটা সিস্টেম, অর্থ বিভাগ।

রাজস্ব খাত

বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা পরিস্থিতির কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যখন বিপর্যস্ত হয়ে সরকারী অর্থ সাহায্যে টিকে থাকার চেষ্টায় লিপ্ত, এমন এক কঠিন সময়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব নীতির মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্হিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৯,১৮০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন

খাতসমূহ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে ৫৩,০০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩,৮৫০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৫,৯৭০ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৭,৪৩৬ কোটি টাকা যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩.১৯ শতাংশ বেশী। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আদায় হয়েছে ৩৫,১২৬ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১৩০৪ কোটি টাকা বা ১২.২১ শতাংশ বেশী। চলতি অর্থবছরের (২০০৮-০৯) প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.২৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট রাজস্ব জিডিপির অনুপাত ছিল ১১.১৭ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে এ অনুপাত ১১.২৪ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ১৭.২৭ শতাংশ এবং চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৫.৩ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মূলতঃ জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাসের ফলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-কে কোন ভর্তুকি প্রদানের প্রয়োজন না হওয়ায় রাজস্ব ব্যয়-জিডিপি অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি'র আকার ছিল ২২৫০০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮৪৫০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৩.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ২৩০০০ কোটি টাকা। মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৪৫.৮ শতাংশ।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৬.২ শতাংশ। বৈদেশিক অনুদানসহ এ ঘাটতি জিডিপি'র ৫.৪ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সার্বিক বাজেট ঘাটতি বৈদেশিক অনুদান ব্যতিরেকে ৪.০ শতাংশ ও বৈদেশিক অনুদানসহ ৩.২ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের অংশ যথাক্রমে জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ ও ৩.৭ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন জিডিপি'র ২.২ শতাংশ।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) ২৯৫১৮.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২০৭৮০.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৮৩ ভাগ। এসময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২৮৫৬৭.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ২৭৮৮৭.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের খাত-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ (নীট) জুন ২০০৮ শেষের ৪৬৯৯৯.৬০ কোটি টাকা থেকে ৬৫১৯.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৮৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ ২০০৫৬.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এ হার প্রাক্কলিত মূল দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ বেশি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রিজার্ভ মুদ্রা জুন ২০০৮ শেষের ৫২৭৮৯.৬০ কোটি টাকা থেকে ৬২২৩.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৯ শেষে ৫৯০১২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ২৪০১.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পুঁজিবাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৮ সালের জুন মাসের ৩৭৮টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪১২টি হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মুলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৩৭২১৫.৬০ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০০৮ এর ২৮৪৩৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩০.৮৬ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০০৮ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মুলধনের পরিমাণ মোট ৯৬৪৮০ কোটি টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে ১০৫৯৫৩ কোটি টাকার তুলনায় ৯.৮২ শতাংশ

বেশী। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক ২০০৮ সালের জুন শেষে ২৫৮৮.০৩ ছিল যা ডিসেম্বর ২০০৮ শেষে ২৩০৯.৩৫ তে দাঁড়ায় । চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৮ মাসের ২৩১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৮ এ ২৩৮টিতে উন্নীত হয়। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মুলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৮ এর শেষে ১০,২২২ কোটি টাকা থেকে ১৮.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১২,১৬০.৩২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মুলধনের পরিমাণ জুন ২০০৮ এর ৭৭,৭৭৪ কোটি টাকা থেকে ৩.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৮ এ মোট ৮০,৭৬৮ কোটি টাকা হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মুল্যসুচক জুন ২০০৮ শেষে ছিল ৯০৫০.৫৬ যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ শেষে দাঁড়ায় ৮৬৯২.৭৫।

মুদ্রা নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

চলমান বিশ্ব আর্থিক খাত বিপর্যয়ের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিপুল আকারে সরকারি সহায়তা ও উদ্দীপক প্রয়োগ সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসতে সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বহিঃখাতে স্বল্পমেয়াদী মুলধন প্রবাহের সীমিত উন্মুক্ততার সুত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বহির্বিশ্বের আর্থিক বিপর্যয় ও ঋণ সংকটের বিরূপ প্রভাব সীমিত পর্যায়ে থাকলেও বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজমান মন্দা অবস্থায় চলতি অর্থবছরের আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স, সরকারি খাতে বিদেশি ঋণ/অনুদান এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এষড়নধষ ঋরহধহপরধষ ঈৎরংরংঃএর সম্ভাব্য প্রভাব সম্সর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সতর্কতামুলক উদ্যোগ গ্রহণকল্পে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবেলায় গঠিত টাস্কফোর্স এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সরকার কর্তৃক একটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ চুড়ান্ত করা হয়। উক্ত প্যাকেজের আওতায় ঋরংপধষ ও ঋরহধহপরধষ প্রণোদনার পাশাপাশি চড়ষরপু ংঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়, যা দুটি পর্যায়ে বাস্জ্বায়িত হবে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন মেয়াদে বাস্জ্বায়িতব্য প্যাকেজের আওতায় মন্দা মোকাবেলায় সরকারের ঘোষিত ৩৪২৪.০০ কোটি টাকার প্রণোদনামুলক প্যাকেজের অর্থ ব্যয় করা হবে ভর্তুকি, কৃষি ঋণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা খাতে, যেখানে ভর্তুকির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ রপ্তানি, কৃষি ও বিদ্যুৎ উপখাতের জন্য ব্যয় করা হবে। সরকারের ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে রপ্তানি উপখাতে ১০৫০.০০ কোটি টাকা হতে ১৫০০.০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাতে ৬০০.০০ কোটি টাকা হতে ১২০০.০০ কোটি টাকা এবং কৃষিঋণ (পুনঃমুলধনীকরণ) খাতে ৫০০.০০ কোটি টাকা হতে ১৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। আলোচ্য প্যাকেজের নগদ রপ্তানি সহায়তা পাবে পাটজাত পণ্য (শতকরা ১০ ভাগ), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (শতকরা ১৭.৫ ভাগ), হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ (শতকরা ১২.৫ ভাগ) রপ্তানিকারকরা।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির স্বার্থে "অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩" কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০০৮

পর্যন্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,০৪,৮৩২ টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ২৯৪৫৪.৭৭ কোটি টাকা । তন্মধ্যে মীমাংসাকৃত মামলা ৬৭,৩৩৬টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪২০০.০১ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঠিক ভুমিকা পালন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে এর সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও কার্যকরী কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৫৫.৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সাপেক্ষ ঈবহঃৎধষ ইধহশ ঝঃৎবহমঃযবহরহম চৎড়লবপঃ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৩ সালের শেষার্ধে কাজ শুরু করে এবং আগামী ২০১১ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনর্বিন্যাস এবং আধুনিকায়ন (কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, অটোমেশন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন), সামর্থ্য বৃদ্ধি (গবেষণা বিভাগ শক্তিশালীকরণ, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন ও সুপারভিশন শক্তিশালীকরণ এবং একাউন্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড শক্তিশালীকরণ) এবং আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

ব্যাংকিং সেক্টরে একটি অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং একটি সুষম প্রতিযোগিতামুলক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সমঝোতা স্মারকের আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ২০০৯ এর সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন করা হয়েছে যা চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। তাছাড়া, মুলধন ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক প্রণীত জবপধঢ়রঃধষরুধঃরড়হ ধহফ চৎড়মৎবংংরাব ঋরাব ণবধৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চষধহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে পুনঃপ্রস্তুতকরণ (যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)। এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

আন্তর্জ্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রমকে আরো বেশি শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে গৃহীত (মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) এরূপ উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক-কোম্পানীসমুহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১২০ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং একই আইনের ১৫(৫) ধারার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে আমানতকারীদের মধ্য থেকে ৩ বছর মেয়াদে ২ জন পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় অপ্রতুল ঋণ সুবিধা পাওয়া অগ্রাধিকার খাতগুলোসহ (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষি, নিম্নব্যয়ী বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি) উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধিমুখী খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের সমর্থনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়ক ভুমিকা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি অপরিহার্য ভোক্তা ঋণসহ চাহিদা চাপ বৃদ্ধিকারী খাতগুলোতে ঋণ যোগানের মাত্রাহীন প্রবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিতকরণ;

- ব্যাংকসমুহের আর্থিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগস্ট ২০০৮ থেকে ৩ বছরের মধ্যে ব্যাংক-কোম্পানীর ন্যুনতম আদায়কৃত মুলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে আদায়কৃত মুলধন অন্যুন ২০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- আগস্ট ২০০৮ থেকে মুলধন সংরক্ষণে ঘাটতি থাকা অবস্থায় ব্যাংকগুলোকে নগদে লভ্যাংশ না প্রদানের পরামর্শ প্রদান।

বৈদেশিক খাত

চলতি অর্থবছরে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে উর্ধ্বগতির ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাকের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নীটওয়্যার পোশাকে ২১.৫০ শতাংশ এবং ওভেন পোশাকে ১০.৯৪ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় নীটওয়্যার পোশাকে ২১.৩৯ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ওভেন পোশাকে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৮.৪২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৬৩৪.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১৪.৫১ শতাংশ বেশি।

উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) দাঁড়ায় ২১৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ২৬.১০ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৪২৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ১২.৩৯ শতাংশ বেশি।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (সাময়িক হিসাব) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৭৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাময়িক হিসেবে ১০৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্বব্যপী মন্দা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ বহিঃখাতে যৌক্তিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য তা নির্ভর করবে রপ্তানি সম্ভাবনার বাস্তবায়ন, রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার ধরে রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার উপর।

দেশে পর পর দু'বার বন্যা ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘুর্ণিঝড় সিডরের কারণে কৃষি খাতের ব্যাপক ক্ষতির ফলে কৃষি উপকরণ আমদানি ও বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্য, পেট্রোলিয়াম পণ্যের মুল্য বৃদ্ধিতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকা-ডলার বিনিময় হারে সামান্য চাপ পরিলক্ষিত হয়। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের নিম্ন গতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে টাকার ধঢ়ঢ়ৎবপরধঃরড়হ প্রবণতা পরিহারকল্পে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিযোগী ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাজার মুল্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ফলে আলোচ্য সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক বিশ্ব আর্থিক মন্দার প্রভাবে বৈদেশিক অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সে প্রতিকুল প্রভাব না পড়লে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার স্বাভাবিক গতি বজায় থাকলে বিনিময় হারের এ স্থিতিশীলতা অদুর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের গড় ভারিত টাকা ডলার বিনিময় হার ছিল প্রতি ডলার ৬৮.৬০ টাকা, যা চলতি অর্থবছরের মার্চ শেষে প্রতি ডলার ৬৮.৭২ টাকায় দাঁড়ায়।

কৃষি

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি' ৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি ডুৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ খাতে পুনঃ অর্থায়নের জন্য সর্বমোট ১১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা এবং সোনালী ব্যাংক ৩৮৩ কোটি টাকা)। তাছাড়া কৃষি ঋণ প্রবাহ সচল ও শক্তিশালী করার জন্য কৃষি ব্যাংক, রাকাব, কর্মসংহান ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৫০০ কোটি টাকা পুনঃ মূলধনীকরণ (জব-পধঢ়রঃধষরুধঃরড়হ) এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতির কারণে আমাদের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওর এলাকায় পানি অপসারণ, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৫৩,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ১৬,০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিদ্ধকাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে স্থির মূল্যে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ২০.৬০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.৮৩ শতাংশ। সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৬.০৩ শতাংশ এবং মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৪.৫৭ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতদ্বয়ের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.১৮ শতাংশ এবং ৪.৬৫ শতাংশ। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৩৮.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আউশ উৎপাদন হয়েছে ১৮.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী আশা করা হচ্ছে যে, আমন ফসলের উৎপাদন ১১৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও বোরোর উৎপাদন ১৮০.০০ লক্ষ মেট্রিক টনে উপনীত হবে। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৩.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ০.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি অর্থবছরের ২০ মে পর্যন্ত ৭.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ০.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে বোরো ৫.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আমন ১.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। আমন সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয় ধান ১৬ টাকা/কেজি এবং চাল ২৬ টাকা/কেজি। বোরো সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয় ধান ১৪ টাকা/কেজি, চাল ২২ টাকা/কেজি। চলতি অর্থবছরের ২০ মে পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যে আমদানী লক্ষ্যমাত্রা ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০ মে পর্যন্ত ৮৯.৯৬ হাজার মেট্রিক টন (২৬.৫১ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ৬৩.৪৫ হাজার মেট্রিক টন গম) খাদ্য সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। ১৮ মে পর্যন্ত বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৯.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট ৯৩৭৯.২৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে চলতি অর্থ বছরের মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ৬৯০৭.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৩.৬৪ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের মূল বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের জন্য ভর্তুকি বাবদ ৪২৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল । ঘোষিত প্রণোদনা কর্মসূচিতে এ বরাদ্দ ১৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৫৭৮৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া সারের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চমূল্যে আমদানিকৃত ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া সার যাতে কৃষক পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে (সরকার নির্ধারিত মূল্যে) বিক্রয় করা যায় সে জন্য ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এ খাতে ভতুর্কির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাত একটি গুরত্বপূর্ণ খাত। দেশজ উৎপাদে এ খাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ১৭.৩১ শতাংশ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯.৭৩ শতাংশ। স্থির মূল্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান শতকরা ১৭.৭৮ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত বছরে ছিল ১৭.০০ ভাগ। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.৯২ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে শতকরা ১.২৯ ভাগ কম। এ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোট ১০১৭.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করা হয়েছে তন্মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ৬৪৫.৭৫ কোটি টাকা, আইডিএ প্রদত্ত তহবিল থেকে ২০৬.৩৯ কোটি টাকা, এবং এডিবি প্রদত্ত তহবিল থেকে ২৬৫.৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল অর্থায়ন সুবিধা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরো জোরদার করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। উল্লেখ্য, সরকার এসএমই খাতের উন্নয়নে চড়ষরপু ঝঃৎধঃবমরবং ভড়ৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ ঝসধষষ ধহফ গবফরঁস উহঃবৎঢ়ৎরংবং-২০০৫ প্রণয়ন করেছে।

শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬০,১১৪.৩১ কোটি টাকা ও ৪২,৪৭৩.৮০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৬.২৬ ভাগ এবং শতকরা ৬২.৫৮ ভাগ বেশি। অপরদিকে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১,৬০২.০৭ কোটি টাকা এবং ২৫,৬৮৫.৩৫ কোটি টাকা। শিল্প ঋণের এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড রয়েছে যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ১১৩.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০২.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে পুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১.৫৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেডসমূহে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২.৪২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২.৮২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ১৯১৭.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ২৯৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ তৈরি পোষাক শিল্প ও শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বস্ত্র শিল্প। শিল্পসমূহে মোট ২,৩০,৪০৬ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে, যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা। উল্লেখ্য, ইপিজেড এ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহ বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। ফলে ইপিজেড এ কর্মরত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে এবং এতে করে প্রযুক্তি হস্তান্তর হচ্ছে। এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৩টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, পরিবহন, বাণিজ্য, কৃষি, নির্মাণ এবং সেবা খাতে ৪৪টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্হা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে । ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.৯৬ শতাংশ তবে উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ৯৫১ কোটি টাকা, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬১২ কোটি টাকা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসকল সংস্থার নীট লোকসান ছিল ৯৯৮২.৮৫ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫৪.৪৯ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ৪৪.৩৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ ৪১৪.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছিল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ ৭২৬৯৪.১১ কোটি টাকা। ডিসেম্বর'০৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৪৫টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ১৬৭৫৫.৭০ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১০৯৯.৪৮ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন লোকসানের হার (জঙঅ) ১.৯৯ শতাংশ হলেও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৩.০৫ শতাংশে পৌঁছে । ২০০২-০৩ সালের পর পরিচালন রাজস্বের ওপর শুধুমাত্র ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১৩.৯৬ শতাংশ মুনাফা অর্জিত হয় । ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ছিল ০.১৫ শতাংশ, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ০.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ শক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। দেশের শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা এবং কৃষি ও সেবাখাতে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সরকার আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারনের জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্নমুখি ও বিভিন্ন মেয়াদী কর্মসূচি বাস্জ্বায়ন করছে। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত) দেশে সরকারি খাতে ৩৮১৭ মেগাওয়াট এবং বেসরকারিখাতে ১৭৪৩ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা ৪১৩০ মেগাওয়াট। সরকারি বিনিয়োগের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকার ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৬৮.৬৫ শতাংশ সরকারিখাতে এবং ৩১.৩৫ শতাংশ বেসরকারিখাতে। অপরদিকে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬১.১১ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৩৮.৮৯ শতাংশ বেসরকারিখাতে উৎপাদিত হচ্ছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৮৬.৭৩ শতাংশ গ্যাস ভিত্তিক, ২.৫১ শতাংশ পানি ভিত্তিক এবং ৬.২১ শতাংশ তেল ভিত্তিক। বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৭২ কিলোওয়াট আওয়ার এবং দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে। বিউবো'র মালিকানাধীন পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতের সমগ্র সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালন ও

সংরক্ষণসহ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া বিতরণ ব্যবস্থায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পনী (ডেসকো) প্রভৃতি কাজ করছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭৫ ভাগ পূরণ করে থাকে। দেশে এ যাবৎ মোট ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মধ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর'০৮ পর্যন্ত) প্রকৃত গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে ৮.০৪৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতও এগিয়ে আসছে। পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজি'তে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সিএনজি কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং জ্বালানি আমদানী খাতে সরকারের বাৎসরিক প্রায় ৭৫০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিকাশ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশ পথ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অনুকূলে মোট সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ৪২৭৮.৮৩ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ বিভাগের অনুকূলে ৫৪০৩.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'তে খাতওয়ারি অবদান বিশ্লেষণে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ছিল ১০.৪৪ শতাংশ। স্থির মূল্যে চলতি অর্থবছরে জিডিপি'তে উক্ত খাতের প্রাক্কলিত সাময়িক অবদান ১০.৬১ শতাংশ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় ব্যাপক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত প্রায় ১,২৯,৭৯৩ কিঃমিঃ (কাঁচা রাস্তা ৬৪,৬৯১ কিঃ মিঃ এবং পাকা রাস্তা ৬৫,১০২ কিঃ মিঃ) উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং ৯,৩৮,০৮৯টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ২,৫৯৫টি গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২০,৯২৪ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপন, ১,৯৩৮টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং ৩,৭৪,৩৯৩ হেক্টর জমিতে ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফসিডিআই) ও কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন করেছে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ১৬,৭৪২ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে মোট টোল আদায় হয়েছে ১৩৮.৬৮ কোটি টাকা। সরকার পদ্মা নদীর ওপর সেতু বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। এ সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৫.৫৮ কি. মি. এবং ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান সাপেক্ষে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর নাগাদ এ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহনে নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২৮৩৫.০৪ রুট কিমি (বিজি-৬৫৯.৩৩ কিঃমিঃ, ডিজি-৩৭৪.৮৩ কিঃমিঃ এবং এমজি-১৮০০.৮৮ কিঃমিঃ)। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড দেশের অভ্যন্তরে ও বহিঃবিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ৩টি

এবং আন্তর্জাতিক ১৮টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে বিমান সার্কভুওক্ষ দেশে ৪টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৩টি, প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে ১টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপে ২টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে।

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বর্তমান বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বিটিআরসি'র তথ্যমতে দেশের বেসরকারি ছয়টি সেলুলার মোবাইল অপারেটর কোম্পানির মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৫৮ কোটি। ফিক্সড ফোনের সংখ্যা ১৩.৮৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত টেলি ঘনত্ব ৩১.৯৫ শতাংশ। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে সীমিত বাজেটে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা এবং এতে সকল পাবলিক ডকুমেন্টস ও ফরমস্ পোস্ট করার ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে করে জনসাধারণ সহজেই অনলাইন সার্ভিস পেতে পারে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানব উন্নয়ন। একারণে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এ মানব কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এমডিজিকে সামনে রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক খাতসমূহে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সম্পদ বৃদ্ধি করছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারে ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। বয়স্ক ও নিরক্ষরদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সম্প্রতি প্রকাশিত খরঃবৎবপু অংংবংংসবহঃ ঝঁৎবু-২০০৮ অনুযায়ী বর্তমানে পুরুষদের তুলনায় (৪৮.৬ শতাংশ) নারী সাক্ষরতার হার (৪৯.১ শতাংশ) বেশী।

শিক্ষার পাশাপাশি জনগনের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জুলাই'০৩ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (ঐঘচঝচ)-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নারী ও শিশু উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নারী পুরুষের অসমতা দূরীকরণ ও নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দেশের যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরে এবং উন্নয়নে যুব শক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও অনুদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫-এর তথ্যানুসারে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতিতে (ঈড়ংঃ ড়ভ ইধংরপ ঘববফং-ঈইঘ) ২০০০ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জরিপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (উরৎবপঃ ঈধষড়ৎরব ওহঃধশব) পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ২০০০ সাল অনপেক্ষ দারিদ্রের হার ছিল ৪৪.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময় চরম দারিদ্রের (ঐধৎফ-পড়ৎব ঢ়ড়াবৎঃু) ক্ষেত্রেও নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই জরিপে বিভাগওয়ারি দারিদ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বরিশাল বিভাগে দারিদ্রের

হার সবচেয়ে বেশী (৩৫.৬ শতাংশ) এবং চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে কম (১৬.১ শতাংশ)। এরপরই ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অবস্থান। উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে মাথা গণনা অনুপাতে দেখা যাচ্ছে যে, এ সময় গ্রামীণ দারিদ্র উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ঢাকা বিভাগের গ্রাম এলাকাগুলোর দারিদ্র ২০০০ সালের ৫৫.৯ শতাংশের তুলনায় ২০০৫ সালে ৩৯.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাথা গণনা অনুপাতে দারিদ্র হ্রাসের হার শহরাঞ্চলেও লক্ষ্যণীয়, যা ২০০০ সালে ২৮.২ শতাংশ হলেও ২০০৫ সালে তা ২০.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র প্রবণতা খুলনা বিভাগে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে ২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগন ভূমিহীন এবং মাথা-গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে। মাথা পিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খানার মাসিক নামিক (ঘড়সরহধষ) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান। খানার মাসিক নামিক (ঘড়সরহধষ) আয় ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায় ৭২০৩ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৬০৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১০৪৬৩ টাকা। গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ৬১৩৪ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৫৩১৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৮৫৩৩ টাকা। ২০০৫ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক (ঘড়সরহধষ) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ছিল ৮৩১৫ টাকা ।

বর্তমান সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার/ইস্তেহারে দারিদ্র বিমোচন এবং বৈষম্য দূরীকরণকে (আয় বৈষম্য বা আঞ্চলিক দারিদ্র বৈষম্য) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দারিদ্র নিরসনে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্তবর্তী দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বা আইপিআরএসপি (২০০৩-০৫) এই ধারার প্রথম দলিল, যা পরবর্তীতে ৺টহষড়পশরহম ঃযব চড়ঃবহঃরধষ: ঘধঃরড়হধষ ঝঃৎধঃবমু ভড়ৎ অপপবষবৎধঃবফ চড়াবৎঃু জবফঁপঃরড়হ (ঘঝঅচজ)চ শীর্ষক প্রথম দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি (২০০৫-০৭), ঊীঃবহফবফ চজঝচ (২০০৭-০৮) এবং ৺গড়ারহম অযবধফ: ঘধঃরড়হধষ ঝঃৎধঃবমু ভড়ৎ অপপবষবৎধঃবফ চড়াবৎঃু জবফঁপঃরড়হ ওও (ঘঝঅচজ-ওও)চ শীর্ষক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (২০০৮-১০) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ৺গড়ারহম অযবধফ: ঘধঃরড়হধষ ঝঃৎধঃবমু ভড়ৎ অপপবষবৎধঃবফ চড়াবৎঃু জবফঁপঃরড়হ ওও (ঘঝঅচজ-ওও)চ শীর্ষক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রটিকে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা জুন, ২০০৯ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি, খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি, দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি, আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ সব কর্মসূচিতে বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্র ২০ লক্ষ সুবিধাভোগী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার ক্ষেত্রে ৯ লক্ষ এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া, আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ঈৎবফরঃ ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঋড়ৎঁস (ঈউঋ) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী (ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত) বাংলাদেশের মোট ৫৩৫টি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান-এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৩.৯১ কোটি। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত মোট ৭৩,২৩২.৩৬ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২৪ শতাংশ। সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত সময় ১৪,০৩৪.২৪ কোটি টাকা ও সরকারের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ ৯,৭৫১.৫৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে। তাছাড়া, মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৪,১৮২.৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

বেসরকারিখাত উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি খাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত চলমান অর্থনৈতিক গতিকে সমুন্নত রাখতে সহায়ক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে সরকার বেসরকারি খাতের জন্য যুগোপযোগী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মোট জাতীয় বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র শতকরা ১৯.৯৯ ভাগ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসেবে জাতীয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা প্রায় ২৪.১৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা ১৯.৫৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ছিল জিডিপ্বির ১৩.৫৮ শতাংশ।

বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন, সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্ব এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (ঢ়ঁনষরপ-ঢ়ৎরাধঃব ঢ়ধৎঃহবৎংযরঢ়) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপুর্ণ নীতি। সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে-যেমন মাস্-ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবা খাতে বেসরকারি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার প্রয়াসে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৪টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনি-য়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। বেসরকারি ৬টি সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। সাধারণ বীমা খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৪৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি ২০০৭ সালে সম্মিলিতভাবে ১৪০৪.৩৩ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করেছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৮টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৩৬,২৪৪টি শয্যাসহ ২,২৪৯টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং এর পাশাপাশি ৪,৫০৯টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তরুনদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

মানুষের চারপাশের সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশ ও মানবজীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। পরিবেশের ভাল-মন্দ দুইই মানুষসহ সমগ্র জীব জগতের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্ব বহন করে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও

বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি এবং জাতীয় কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন ক্যাটালিস্ট ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা; কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা; পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ; তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভভষঁবহঃ ঞৎবধঃসবহঃ চষধহঃ স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ, ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি পদক্ষেপ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদনেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় ঝুঁকি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানিয়ে চলার ক্ষমতা ও ক্ষতি প্রশমনের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল নামে তিনশত কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে। এছাড়া, এলডিসি ফান্ড হতে বাংলাদেশের নাপা (ঘঅচঅ) সংশ্লিষ্ট ঈড়সসঁহরঃু-ইধংবফ অফধঢ়ঃধঃরড়হ ঃড় ঈষরসধঃব ঈযধহমব ঞযৎড়ঁময ঈড়ধংঃধষ অভভড়ৎবংঃধঃরড়হ রহ ইধহমষধফবংয শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। বন বিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন ও প্রকৃতি রক্ষায় 'সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল' প্রবর্তন করেছে। উক্ত পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বন রক্ষায় বন বিভাগ বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে সম্পৃক্ত করেছে। এ পদ্ধতির প্রভাব ইতোমধ্যে বনাঞ্চলে পরিলক্ষিত হচ্ছে যার ফলে বনাঞ্চলে পাখি ও বন্য প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সবুজের সমারোহ লক্ষণীয়। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে জবর দখলকৃত এবং অবক্ষয়িত বনভূমিতে ৫৬৪৮৪ হেক্টর বাগান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণরোধ, বন ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, ইকো-পর্যটন উন্নয়ন/সম্প্রসারণ এবং ইকো-পার্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে মহামন্দা বিরাজ করলেও বাংলাদেশের উপর তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। তবে আশংকা করা হচ্ছে যে, আগামী অর্থ বছর মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পড়বে। মন্দার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি একটি 'প্রণোদনা প্যাকেজ' গ্রহণ করেছে। উক্ত প্যাকেজে দেশীয় চাহিদা (উড়সবংঃরপ উবসধহফ) ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে এবং এসএমই খাত, গৃহনির্মাণ তহবিল, সমমূলধন তহবিল ইত্যাদিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মন্দার সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবিলায় সফল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সরকারের ঘোষিত রূপকল্পে আগামী ২০১৩ সালে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে ও ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতার্থে সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (চঁনষরপ চৎরাধঃব চধঃহবৎংযরঢ়-চচচ)-কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে সরকারের ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র নির্মূলসহ দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।